আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স

আদি থেকে অনন্তের পথে

মাহমুদুল হাসান উৎস

প্রথম প্রকাশ: বইমেলা ২০২৫

প্রান্ত প্রকাশন

উৎসর্গ

দিলখোশ আরা বেগম

আমার দিদা'কে। তিনি এখন আকাশের তারা হয়ে গেছেন।
দিদা, আমি এখনো ওই গানটায় তোমাকে খুঁজে পাই।
আমি হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল...

ভূমিকা

"আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স"-নামটা শুনলেই মনে হতে পারে এটি কোনো প্রযুক্তিগত পাঠ্যবই, হয়তোবা গবেষণার গভীর সমুদ্র। কিন্তু আসলে তা নয়। এই বইয়ে এমন কোনো কঠিন বা বিরক্তিকর বিষয়বস্তু নেই। বরং, এআই-এর জটিলতাকে গল্পের সহজ বুননে তুলে ধরার এক অনন্য প্রচেষ্টা এটি।

বইটির শুরুতেই রয়েছে এক স্বপ্নের গল্প– অ্যালান টুরিং নামের এক বিস্ময়মানবের স্বপ্নের গল্প। তিনি একদিন কল্পনা করেছিলেন, যদি মেশিন মানুষের মতো চিন্তা করতে পারে! সেই কল্পনার বীজ থেকেই আজকের এআই-এর জন্ম। দাবা খেলার বোর্ড থেকে শুরু করে চ্যাটজিপিটির জাদু পর্যন্ত এআই-এর এই দীর্ঘ যাত্রার কাহিনি যেন এক দুঃসাহসিক অভিযান।

কীভাবে মানুষের মস্তিষ্কে এআই-এর মতো জটিল চিন্তা ঢুকল? দাবা খেলার পেছনের সূত্র মেনে কীভাবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ভিত্তি তৈরি হলো? আজ চ্যাটজিপিটি কীভাবে আমাদের চিন্তাশক্তিকেও ছাপিয়ে যাচ্ছে? চ্যাটজিপিটির আইকিউ কি মানুষের চেয়ে বেশি? তবে কি আমরা একে মানুষের চেয়ে বুদ্ধিমান বলে মানতে পারব? এমন সব প্রশ্নের উত্তর গল্পের ছলে বোনা হয়েছে এই বইয়ে।

তবে এই বইকে পুরোপুরি মৌলিক বললে ভুল হবে। এর পেছনে অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে আমার এক অসম্ভব প্রিয় বই– এরিক জে. লারসনের "দ্য মিথ অব আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স"। বেশ কিছু কনটেন্ট এবং ধারণা এই বই থেকে নেওয়া হয়েছে, তবে নিজের ঢঙে, ভিন্নভাবে পরিবেশন করেছি।

বিজ্ঞানের জগৎ যেন এক অদ্ভুত খেলা– আজ যা সত্য, কাল তার নতুন সংস্করণ বের হতে পারে। যেমন, আজ একটি এআই-এর ইনপুট গ্রহণের ক্ষমতা ১৫০০ শব্দ, কিন্তু আগামীকাল তা হয়তো ২৫০০ শব্দে পৌঁছাবে! সেক্ষেত্রে এই বইয়ের কিছু তথ্য সময়ের সাথে পুরোনো হতে পারে। তবে তা বিজ্ঞানেরই এক স্বাভাবিক নিয়ম এবং পাঠকেরা নিশ্চয়ই সেটি বুঝবেন।

এই বইয়ের নাম ঠিক করতে সাহায্য করেছেন জনপ্রিয় বিজ্ঞান লেখক আব্দুল গাফফার রনি ভাই। ভাইয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা তো থাকবেই! আর বইটা

নিয়ে আগ্রহ দেখিয়ে আমার মতো অলস মানুষকে দিয়ে লিখিয়ে নেওয়ার জন্য প্রান্ত প্রকাশনের প্রকাশক আমিনুর রহমান ভাইকেও বিশেষ ধন্যবাদ।

বইটির শেষটা সাজানো হয়েছে এক কল্পকাহিনির মাধ্যমে। কীভাবে এআই আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে একদিন আমাদের শেষ করার কাজে লেগে যেতে পারে, সেই গল্প বলা হয়েছে। সেখানে মানবিক অনুভূতির কোনো জায়গা থাকবে না, থাকবে শুধু নির্ধারিত কাজ পূরণের প্রবল একাগ্রতা।

কঠিন বিজ্ঞান আর জটিল পরিসংখ্যানের মাঝে হারিয়ে যেতে চায়নি এই বই। বরং চেয়েছে পাঠকের মনে আনন্দের অনুভূতি জাগিয়ে বইটি শেষ করতে।

তাহলে, চলুন! এআই-এর রহস্যময় জগতে ডুব দিয়ে আসি। বিজ্ঞানের বিস্ময় আর গল্পের মায়াজালে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার আশ্চর্য ভুবন ঘুরে দেখি!

– মাহমুদুল হাসান উৎস

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়	: মেশিন ও মনের সন্ধান	০৯
দ্বিতীয় অধ্যায়	: গণনার যুদ্ধ: টুরিং ও এনিগমা	১৯
তৃতীয় অধ্যায়	: সিঙ্গুলারিটি: অতীতে এবং বর্তমানে	৩৫
চতুর্থ অধ্যায়	: প্রাকৃতিক ভাষা বুঝতে সক্ষমতা	৩৯
পঞ্চম অধ্যায়	: প্রযুক্তিগত কিটশ হিসেবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা	৪৯
ষষ্ঠ অধ্যায়	: আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের জগতে চ্যাটজিপিটি	৮২
সপ্তম অধ্যায়	: বিজ্ঞান কি শেষ হয়ে যাচ্ছে?	৯৮
অষ্টম অধ্যায়	: মিথ নাকি বাস্তবতা	১০৭

(আমি / রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ,
চুনি উঠল রাঙা হয়ে।
আমি চোখ মেললুম আকাশে,
জ্বলে উঠল আলো
পুবে পশ্চিমে।
গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম “সুন্দর”,
সুন্দর হল সে।
তুমি বলবে, এ যে তত্ত্বকথা,
এ কবির বাণী নয়।
আমি বলব, এ সত্য,
তাই এ কাব্য।
এ আমার অহংকার,
অহংকার সমস্ত মানুষের হয়ে।
মানুষের অহংকার-পটেই
বিশ্বকর্মার বিশ্বশিল্প।
তত্ত্বজ্ঞানী জপ করছেন নিশ্বাসে প্রশ্বাসে,
না, না, না--
না-পান্না, না-চুনি, না-আলো, না-গোলাপ,
না-আমি, না-তুমি।
ও দিকে, অসীম যিনি তিনি স্বয়ং করেছেন সাধনা
মানুষের সীমানায়,
তাকেই বলে “আমি”।

প্রথম অধ্যায়

মেশিন ও মনের সন্ধান

অ্যালান টুরিং এক অসাধারণ মানুষ। কম্পিউটার প্রযুক্তির পথিকৃৎ। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে আমাদের যে ধারণা, সেটার শুরুই কিন্তু তার কাছ থেকে। ১৯৫০ সালে তিনি "কম্পিউটিং মেশিনারি অ্যান্ড ইন্টেলিজেন্স" নামে একটা প্রবন্ধ লিখলেন। সেই সময়ের মানুষের জন্য সেটা ছিল বৈপ্লবিক। প্রবন্ধটা পড়লে মনে হবে, যেন এক ভবিষ্যতের কথা বলা হয়েছে। সেখানে তিনি দাবি করলেন, মেশিনও একদিন মানুষের মতো বুদ্ধিমান হতে পারবে।

শুনতে বেশ অদ্ভুত লাগতে পারে, তাই না? কারণ সেই সময় কম্পিউটার মানেই ছিল বিশাল একটা যন্ত্র। দেখতে ভারী, কাজের গতি ছিল ধীর। এত ধীর যে, একটা পারমাণবিক বিস্ফোরণের ব্যাসার্ধ বের করতে হলে কত সময় লেগে যেত তার ঠিক নেই। এই মেশিনগুলো তখন শুধু বৈজ্ঞানিক সমীকরণ আর কোড ভাঙার কাজে ব্যবহৃত হতো।

তবু টুরিং দেখালেন স্বপ্ন। বললেন, একদিন আসবে যখন কম্পিউটার শুধু হিসাবনিকাশের জন্য নয়, চিন্তাও করতে পারবে। তখন মানুষ কল্পনাও করতে পারেনি যে, কম্পিউটার এমন কিছু করবে।

তিনি তার প্রবন্ধে একটা "ইমিটেশন গেম" এর কথা বললেন। মজার খেলা। খেলার নিয়ম ছিল এমন একজন পুরুষ আর একজন মহিলা থাকবে, কিন্তু তাদের মুখ দেখা যাবে না। আর একজন বিচারক থাকবে, যিনি তাদের প্রশ্ন করবেন। উদ্দেশ্য হলো, উত্তর শুনে বিচারক ঠিক করবেন কে পুরুষ আর কে মহিলা।

টুরিং বললেন, যদি পুরুষ আর মহিলার জায়গায় একটা মানুষ আর একটা মেশিন রাখা হয়, আর বিচারক যদি ঠিক বুঝতে না পারেন কোনটা মানুষ, তাহলে মেশিনকে বুদ্ধিমান হিসেবে মেনে নিতে হবে। এটাই ছিল "টুরিং টেস্ট"।

কী অদ্ভুত, তাই না? তবে টুরিং এটা পরিষ্কার করে বলেছিলেন– বুদ্ধিমত্তা মানে এখানে চিন্তা করা নয়; বরং এমন কিছু করা, যা দেখতে বুদ্ধিমানের মতো।

টুরিং টেস্ট ছিল এমন এক পরীক্ষা, যা তখনকার দিনে অসম্ভবই মনে হতো। এবং সত্যি বলতে, আজ অবধি কোনো কম্পিউটার সেই টেস্ট পাশ করতে পারেনি। কিন্তু টুরিং এর সাহসিকতা ছিল দেখার মতো। তিনি ভবিষ্যৎকে দেখেছিলেন এমনভাবে, যা অন্যরা কল্পনাও করতে পারেনি।

১৯৫০ সালে টুরিং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে যে সাহসী বক্তব্য দিয়েছিলেন, তার ফলে একটি নতুন শৃঙ্খলা তৈরি হলো– এআই। এই এআই গড়ার পেছনে অনেক পথিকৃৎ কাজ শুরু করলেন। তারা সবাই টুরিং-এর সাথে একমত হলেন, যদি কোনো কম্পিউটার মানুষের মতো বিশ্বাসযোগ্য কথোপকথন চালাতে পারে, তাহলে সেটাকে চিন্তাশীল না বলে উপায় নেই।

কিন্তু টুরিং শুধু কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে কাজ করেননি। তার কাজের ব্যাপ্তি ছিল আরও বিস্তৃত। ১৯৩৬ সালে তিনি একটি গণিত বিষয়ক প্রবন্ধ লিখলেন। সেই প্রবন্ধে "কম্পিউটার" শব্দের সুনির্দিষ্ট অর্থ ব্যাখ্যা করলেন। তখন "কম্পিউটার" বলতে বোঝাত এমন একজন মানুষ, যিনি নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে ধাপে ধাপে কাজ করেন।

সেই প্রবন্ধেই টুরিং প্রথম বললেন, মানুষ নয়, মেশিনও এমন কাজ করতে পারে। তার এই কথা ছিল নতুন এক ধারণার জন্ম। তবে তখনও তিনি মেশিনের চিন্তা বা মন নিয়ে কিছু বলেননি। তার মতে, মেশিন কাজ করবে স্বয়ংক্রিয়ভাবে, কোনো মানুষের সাহায্য ছাড়াই।

তিনি এটাও বললেন, মেশিনের এই কাজগুলোতে কোনো "ইনটুইশন" বা অন্তর্দৃষ্টির দরকার নেই। কারণ অন্তর্দৃষ্টি মানে হলো এমন সিদ্ধান্ত, যা আমাদের চিন্তা করার আগেই মনের মধ্যে চলে আসে। টুরিং বলেছিলেন, বুদ্ধিমত্তার কাজ হলো এই অন্তর্দৃষ্টিকে নিশ্চিত করা।

১৯৩৬ সালে টুরিং তার "কম্পিউটিং মেশিন" নিয়ে যে কাজ করেছিলেন, সেটা শুধু কম্পিউটার বিজ্ঞানের ভিত্তিই তৈরি করেনি, বরং গণিতের জগতে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি এনে দিয়েছিল। তবে, টুরিং নিজেই হয়তো মনে করেছিলেন, তার প্রাথমিক ধারণাগুলোতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাদ পড়ে গেছে।

টুরিং ও গোডেল: বুদ্ধিমত্তার সীমা ও সম্ভাবনার সন্ধান

গণিতের জগতে টুরিং-এর স্বপ্ন ছিল অনেক বড়। পিএইচডি গবেষণায় তিনি মনের ধারণা এবং মানব ক্ষমতা দিয়ে সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করেন।

সেখানে তিনি একটি চমৎকার কথা বলেছিলেন– গণিতীয় যুক্তি দুই ধরনের ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে: 'ইনটুইশন' এবং 'বুদ্ধিমত্তা'।

এমন সময়ে টুরিং-এর মতোই আরেকজন ছিলেন যিনি বুদ্ধিমত্তা নিয়ে ভাবছিলেন– কুর্ট গোডেল। গণিতের ইতিহাসে গোডেল এক বিখ্যাত নাম। তিনিও মনের কাজ আর যান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য নিয়ে চিন্তা করছিলেন।

গোডেলের প্রশ্ন ছিল খুব সহজ, মানুষের যে ক্ষমতা সত্য বা অর্থ খুঁজে বের করতে পারে, সেটা কি মেশিনের মাধ্যমে করা সম্ভব?

এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে গোডেল আবিষ্কার করলেন তার বিখ্যাত "অসম্পূর্ণতা তত্ত্ব"। ১৯৩১ সালে এই তত্ত্ব প্রমাণ করল গণিত এবং যান্ত্রিক পদ্ধতির একটি সীমাবদ্ধতা আছে। সবকিছু নিয়ম মেনে করা সম্ভব নয়।

কুর্ট গোডেলের অসম্পূর্ণতার তত্ত্ব এমন একটি ধারণা, যা গণিত, যুক্তিবিজ্ঞান এবং কম্পিউটার বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক গভীর পরিবর্তন এনেছে। সহজ ভাষায়, গোডেলের তত্ত্ব বলে যেকোনো সুসংগঠিত (formal) এবং অস্পষ্ট (consistent) নিয়ম বা পদ্ধতির মধ্যে এমন কিছু সত্য থাকতে বাধ্য, যা সেই পদ্ধতি মেনে প্রমাণ করা সম্ভব নয়। একই সঙ্গে, কোনো পদ্ধতি নিজেই তার অস্পষ্টতাকে প্রমাণ করতে পারে না। অর্থাৎ, এমন কোনো বই বা নিয়ম তৈরি করা সম্ভব নয়, যা সব সত্যকে ধরে রাখতে পারে এবং নিজেকে অস্পষ্ট হিসেবে প্রমাণ করতে পারে।

ধরা যাক, একটি বই দাবি করছে যে, এতে পৃথিবীর সব সত্য কথা লেখা আছে। এখন, যদি এমন একটি কথা থাকে– "এই বইতে এই সত্যটি লেখা নেই", তাহলে তা সত্য হলেও বইটি এই কথা নিজেই প্রমাণ করতে পারবে না। কারণ, যদি বইতে এই কথা লেখা থাকে, তবে এটি ভুল হবে (কারণ এটি বলছে এটি লেখা নেই)। আবার যদি এটি লেখা না থাকে, তবে সেটি সত্য হবে, কিন্তু বইতে তা নেই। এই দ্বন্দ্বই গোডেলের তত্ত্বের মূল বক্তব্য।

গোডেলের তত্ত্বে প্রথমে প্রমাণ করা হয় যে, গণিতের মতো যেকোনো সুশৃঙ্খল এবং অস্পষ্ট পদ্ধতিতে (যেমন– অঙ্ক, জ্যামিতি) এমন কিছু সমস্যার উদ্ভব হয়, যা সেই পদ্ধতিতে সমাধান করা সম্ভব নয়। এছাড়া, এই পদ্ধতি কখনোই নিজেকে "সঠিক" বা "অস্পষ্ট" বলে প্রমাণ করতে পারবে না। এটি গণিতের এক বড় সীমাবদ্ধতা দেখায়।

গোডেলের অসম্পূর্ণতার তত্ত্ব আধুনিক কম্পিউটার বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপন করেছে। অ্যালান টুরিং এই ধারণা ব্যবহার করে প্রমাণ করেছেন যে, কিছু সমস্যার জন্য কোনো অ্যালগরিদম তৈরি করা সম্ভব নয়। এটি শুধু গণিত নয়, দর্শন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং জ্ঞানতত্ত্বের ক্ষেত্রেও গভীর প্রভাব ফেলেছে। এই তত্ত্ব আমাদের শেখায় যে, মানুষের বুদ্ধি এবং জ্ঞানেরও কিছু সীমাবদ্ধতা আছে।

এ ছিল এক নতুন ভাবনার সূচনা। টুরিং যেমন মেশিনকে স্বয়ংসম্পূর্ণ বলে বিশ্বাস করতেন, তেমনি গোডেল দেখিয়েছিলেন, মানুষের চিন্তার ক্ষমতা যন্ত্রের বাইরে।

এখানে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, টুরিং এবং গোডেল দুজনেই বুদ্ধিমত্তার মূল উপাদানগুলো নিয়ে ভেবেছিলেন, কিন্তু তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ভিন্ন। টুরিং চেয়েছিলেন একটি বৈজ্ঞানিক শৃঙ্খলা তৈরি করতে, যেখানে মেশিনের বুদ্ধিমত্তা পরীক্ষা করা যাবে। আর গোডেল চেয়েছিলেন এই পরীক্ষা দিয়ে মেশিনের সীমাবদ্ধতাকে বোঝাতে।

এই দুই দিক থেকেই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ভবিষ্যৎ তৈরি হয়।

আজকের দিনে আমরা হয়তো এমন কিছু আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স তৈরি করেছি, যা আমাদের চমকে দেয়। স্মার্টফোনের ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্ট, স্বয়ংক্রিয় গাড়ি, এমনকি যন্ত্র দিয়ে রোগ নির্ণয়– সবই টুরিং-এর সেই সাহসী চিন্তার ফসল। তবে, এআই এর সীমাবদ্ধতাও রয়ে গেছে।

গোডেলের মতোই আমরা এখনো জানি, কিছু প্রশ্নের উত্তর মানুষের মস্তিষ্কই কেবল খুঁজে পেতে পারে। কম্পিউটার যতই উন্নত হোক, মানব চিন্তার গভীরতা, সৃজনশীলতা এবং আবেগের কাছে সেটি এখনও শিশু।

বুদ্ধিমত্তার ভুল বা সীমাবদ্ধতা এটাই– মেশিন হয়তো মানুষের মতো চিন্তা করতে পারবে, কিন্তু মানুষের মতো অনুভব করতে পারবে কি?

এই প্রশ্নটাই এখনো উত্তরহীন।

গোডেলের সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর গল্প

শীতের একটি সকাল। ঘরে বসে একমনে কাগজের ওপর লিখছেন তরুণ কার্ল গোডেল। জানালার বাইরে সাদা কুয়াশায় ঘেরা চারপাশ। পৃথিবী যেন থমকে গেছে, শুধু কাগজে কলমের শব্দ শোনা যাচ্ছে। গোডেল কাগজে

লিখছেন এক জটিল পদ্ধতির গল্প, যা কোনোভাবেই সাধারণ মনে হয় না। তিনি ভাবছিলেন-মানুষের মতোই যদি একটি গাণিতিক মডেল বা পদ্ধতি তৈরি করা যায়, যেখানে এটি নিজের বিষয়ে কথা বলতে পারে, তাহলে সেটা কেমন হবে?

গোডেল গভীরভাবে ভাবতে শুরু করলেন। গণিতকে তিনি একটা ভাষার মতো দেখলেন– একটা প্রাকৃতিক ভাষার মতো, যেমন ইংরেজি বা জার্মান। তিনি ভাবলেন, "এটা কি নিজের সীমাবদ্ধতার কথা বলতে পারবে?" এর উত্তর খুঁজতে গিয়ে তিনি এক মহাজাগতিক রহস্যের সন্ধান পেলেন।

গণিতের মতো প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতি সত্য এবং মিথ্যার সুনির্দিষ্ট প্রকাশের সুযোগ দেয়। আমরা নিয়ম ব্যবহার করে কিছু প্রমাণ করি এবং নিশ্চিত হই যে, সেটি সত্য। কিন্তু গোডেলের মনে একটা বড় প্রশ্ন জাগল, "এমন কি কোনো সত্য থাকতে পারে, যা প্রমাণ করা যায় না?"

তিনি কিছু সমীকরণ লিখলেন। যেমন, "২ + ২ = ৪।" এটাকে সবাই সত্য বলে জানে। এ ধরনের সাধারণ সমীকরণ গাণিতিক পদ্ধতির সত্য উক্তি এবং গাণিতিক নিয়মে প্রমাণযোগ্য। কিন্তু গোডেল জানতেন, এর বাইরে কিছু আছে।

সে সময় গণিতবিদদের একটি সুন্দর বিশ্বাস ছিল– পুরো গণিত একটি নির্ভুল পদ্ধতি। এ ধারণা ছিল, যন্ত্র সঠিক নিয়মে কাজ করলে সব গাণিতিক সত্য উদ্ভাবন করতে পারবে। কিন্তু গোডেল দেখালেন, এই ধারণা একদম ভুল। চমকে গেলেন?

গোডেল এমন একটি অদ্ভুত ধারণা আবিষ্কার করলেন, যেটা আগে কেউ ভাবেনি। তিনি দেখালেন, গণিতের ভেতরেই এমন কিছু উক্তি তৈরি করা সম্ভব, যা পদ্ধতিকে সমস্যায় ফেলে দেয়। একটি উদাহরণ বলি– "এই উক্তিটি এই পদ্ধতিতে প্রমাণযোগ্য নয়।"

এখন ভাবুন, যদি উক্তিটি সত্য হয়, তবে এটি প্রমাণ করা যায় না। আবার, যদি মিথ্যা হয়, তবে উক্তিটি আসলে সত্য! সত্য মানে মিথ্যা, আর মিথ্যা মানে সত্য। এটি এক বিরোধ।

গোডেলের এই স্ব-উল্লেখের ধারণাটি গণিতের জন্য একটি বিপ্লব নিয়ে এলো। তিনি দেখালেন, গণিতের মতো পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা আছে। এটি এমন কিছু প্রমাণ করতে পারে না, যা সত্য। অন্যদিকে, আমরা মানুষ– আমাদের মস্তিষ্ক এ ধরনের সত্য দেখতে পারে।

গোডেল তার সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পর হয়তো একা বসে জানালার বাইরে তাকিয়ে ছিলেন। তার চোখে তখন এক নতুন জগৎ। তিনি বুঝতে পারছিলেন, তার এই আবিষ্কার গণিতের প্রচলিত বিশ্বাসে বড় এক ধাক্কা দিতে চলেছে।

গল্পটা এখানেই শেষ নয়। গোডেলের এই অসম্পূর্ণতা তত্ত্ব আমাদের শিখিয়েছে যে, মস্তিষ্ক আর যন্ত্র এক নয়। কোনো যন্ত্র, যতই শক্তিশালী হোক না কেন, সব সত্য দেখতে পারে না।

গোডেলের এই গভীর অন্তর্দৃষ্টি আমাদের মনে একটি চিরকালীন প্রশ্ন ছেড়ে যায়– আমরা কি সত্যিই সব জানতে পারি? নাকি কিছু সত্য চিরকাল আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকবে?

মানুষ বনাম যন্ত্র: সীমাবদ্ধতার গভীরতা ও সম্ভাবনার আলো

সকালবেলার সূর্যের আলো জানালা দিয়ে পড়ছে। কাগজ-কলম ছড়ানো টেবিলে একজন মানুষ বসে আছে, তার মন ডুবে আছে চিন্তায়। প্রশ্নটা গভীর– মানুষের মনের সীমাবদ্ধতা আর যন্ত্রের সীমাবদ্ধতা।

সে আপন মনে ভাবে, "অন্তর্দৃষ্টি ধারণা চমৎকার। গোডেল তো বলেছিল, এমন কিছু সত্য আছে যেগুলো আমরা মানুষ দেখতে পাই, কিন্তু পদ্ধতিগত নিয়ম দিয়ে কখনোই প্রমাণ করা যায় না। সত্য আর প্রমাণযোগ্যতার পথ আলাদা।"

একটু থেমে সে আবার ভাবতে শুরু করে, "তাহলে কি মেশিন আর মানুষের মধ্যে পার্থক্য এখানেই? মেশিন তো শুধু নিয়ম মেনে চলে। আমাদের মতো তার নিজস্ব চোখ নেই, তাই সে এমন কিছু দেখতেই পারে না যা নিয়মের বাইরে।"

চিন্তাটা আরও গভীরে যায়। "গোডেলের তত্ত্ব তো হিলবার্টের চ্যালেঞ্জ ধূলিসাৎ করে দিয়েছিল। হিলবার্ট চেয়েছিলেন সমস্ত গণিতকে একটি দৃঢ় ভিত্তিতে দাঁড় করাতে। কিন্তু গোডেল প্রমাণ করলেন, কোনো পুরোপুরি

প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতি নিজেই এমন কিছু প্রমাণ করতে পারে না, যা তার নিয়মের বাইরে।"

সে জানালার দিকে তাকিয়ে থাকে। "নির্ধারণযোগ্যতার প্রশ্নটা এখনো উত্তরহীন। কোনো ব্যবস্থা যদি নির্ধারণযোগ্য হয়, তবে তার নিয়ম মেনে তৈরি যে-কোনো বক্তব্য প্রমাণ করা যাবে। উদাহরণস্বরূপ, ২ + ২ = ৪ অবশ্যই সত্য, আর ২ + ২ = ৫ অবশ্যই মিথ্যা। কিন্তু জটিল সত্যগুলো কি একইভাবে প্রমাণ করা সম্ভব?"

কাগজে কলম দিয়ে কয়েকটি লাইন টেনে সে নিজের মনকে স্থির করার চেষ্টা করে। "গণিত তো একসময় মনে করা হতো সমস্ত গণনার ভিত্তি। যদি গণিত নিজেই নির্ধারণযোগ্য না হয়, তবে কি এটা প্রমাণিত হয় যে, গণিতবিদরা শুধু নিয়ম আর প্রতীকের একটি খেলা খেলছে?"

চিন্তাটা কেমন যেন ভারী হয়ে আসে। "গোডেলের তত্ত্ব আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে, এমন কিছু সত্য আছে যা মেশিন কখনোই দেখতে পাবে না। কিন্তু আমরা মানুষ? আমাদের মন সেই সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করতে পারে। হয়তো এটাই আমাদের এবং যন্ত্রের মধ্যে সবচেয়ে বড় পার্থক্য।"

সে জানালার বাইরের আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। সূর্যের আলো আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। এই আলো যেন তার চিন্তার প্রতীক, মনের আলো যা যন্ত্র কখনোই ধারণ করতে পারবে না।

গোডেল থেকে টুরিং: সীমাবদ্ধতার পথে বুদ্ধিমত্তার উদ্ভব

বর্ষার বিকেল। জানালার কাচ বেয়ে বৃষ্টির জল গড়িয়ে পড়ছে। একজন মানুষ টেবিলে বসে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। সামনে ছড়ানো কয়েকটি বই। সেই বইয়ের পাতা থেকে উঠে আসে টুরিং আর গোডেলের গল্প।

গোডেলের ফলাফল মানুষকে ভাবিয়ে তুলেছিল। আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থাগুলো যতটা শক্তিশালী, তারচেয়েও বেশি সীমাবদ্ধ। এই সীমাবদ্ধতাগুলোই যেন প্রকট হয়ে উঠছিল। টুরিং ছিলেন এই সীমাবদ্ধতায় মুগ্ধ। হিলবার্টের চ্যালেঞ্জের অবশিষ্ট অংশ নিয়ে কাজ করতে গিয়ে তিনি ভাবতে শুরু করেন–আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থাগুলোর জন্য কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া কি আদৌ সম্ভব?

১৯৩৬ সালে তিনি লিখলেন তার বিখ্যাত প্রবন্ধ "Computable Numbers।" প্রবন্ধটি ছিল একেবারে নতুন দিশা, কিন্তু উত্তরটা ছিল নেতিবাচক। টুরিং প্রমাণ করলেন, কোনো সার্বজনীন সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া সম্ভব নয়। তিনি উপলব্ধি করলেন, গোডেলের স্ব-উল্লেখের ধারণাটি কম্পিউটার প্রোগ্রামগুলোর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। বিশেষ করে, এমন কিছু বাস্তব সংখ্যা থাকবে যেগুলো নির্দিষ্ট কোনো পদ্ধতিতে তাদের দশমিক সম্প্রসারণ বের করা যায় না।

টুরিং এখানে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক নিয়ে আসেন। উনিশ শতকের গণিতবিদ জর্জ ক্যান্টরের ফলাফল তিনি ব্যবহার করলেন। ক্যান্টর প্রমাণ করেছিলেন, বাস্তব সংখ্যা অসীম, কিন্তু পূর্ণসংখ্যার চেয়ে অনেক বেশি। এটা বুঝতে পারা এক বিশাল সাফল্য, কিন্তু টুরিং এটাকে আরও গভীরভাবে ব্যবহার করলেন।

তিনি দেখালেন, এমনকি গণিতের ক্ষেত্রেও, শুধুমাত্র নিয়ম যথেষ্ট নয়। হিলবার্ট ভুল ছিলেন। টুরিং-এর কাজ আবারও প্রমাণ করল যে, গণিত নির্ধারণযোগ্য নয়।

বইয়ের পাতা উল্টে যেতে যেতে সামনে আসে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রসঙ্গ। টুরিং যে যন্ত্রটি কল্পনা করেছিলেন, সেটি কোনো অন্তর্দৃষ্টি ছাড়াই কাজ করে। সেটাই আজকের কম্পিউটারের ভিত্তি। এই যন্ত্রকে আমরা টুরিং যন্ত্র বলি। বড় একটি আইরনি হলো, গণনা তাত্ত্বিক কাঠামোটি তৈরি হয়েছিল গণিতের সীমাবদ্ধতা প্রমাণ করার জন্য, অথচ সেটাই হয়ে উঠল কম্পিউটারের ভিত্তি।

১৯৩৮ সালে, পিএইচডি গবেষণায়, টুরিং আরও নিয়ম যুক্ত করে "গোডেল সমস্যা" সমাধানের আশা করেছিলেন। কিন্তু তিনি বুঝতে পারলেন, নতুন এবং আরও শক্তিশালী ব্যবস্থাগুলোর জন্য নতুন এবং আরও জটিল গোডেল সমস্যা তৈরি হবে। এই অসম্পূর্ণতার কোনো শেষ নেই।

তবু, এই আনুষ্ঠানিক আলোচনার ভেতরে লুকিয়ে ছিল একটি অদ্ভুত ধারণা। হয়তো অন্তর্দৃষ্টি এমন একটি ক্ষমতা, যা কোনো অ্যালগরিদম বা নিয়মের মধ্যে বাধা নয়। বৃষ্টির শব্দে যেন কথাগুলো আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে–মনের সেই অন্তর্দৃষ্টি, যন্ত্রের বাইরে থাকা এক অবিনশ্বর সত্য।